Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501003 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

'Miraculous Dialogue':
'Two different mythologies, different perspectives, different types of tension'
'অলৌকিক সংলাপ': 'দুটো ভিন্ন পুরাণ, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, ভিন্ন ধরনের আততি'

Arkopaul Dutta
Researcher, Teaching Assistant
Bengali Department
Presidency University

Received on: 10th March 2026
Accepted on: 21st March 2026

Abstract:
'Aloukik Sanglap' (Supernatural Dialogues) is an extraordinary creation by Sisir Kumar Das. In this work, he brings face-to-face — standing in direct confrontation — helpless, sinful, sorrowful, and anguish-ridden human figures carefully selected from Greek and Indian mythologies, paired together by the affinities of destiny. They settle their own accounts, voice their regrets, lament their fates, and at times even rise up in accusation; and within this dramatic arena, we are afforded a glimpse of our own inevitable archetypes. Comprising ten dialogues or plays bound together under a single cover, the collection constitutes 'Aloukik Sanglap'. Sisir Kumar Das's 'Aloukik Sanglap' is primarily concept-driven rather than action-oriented. This dramatic volume also serves as a testament to his distinctive theatrical vision. In the present essay, with 'Aloukik Sanglap' as the focal point, an attempt has been made to analyze Sisir Kumar Das's exceptional dramatic sensibilities, his unique literary philosophy, and the interplay between the Greek and Indian characters featured in the work.

Key Words:
Aristotle, Kalidasa, Dhritarashtra, Oedipus, Tiresias, Parashurama, Orestes, Abhimanyu, Iphigenia, Dialogue

মূল আলোচনা

বিশিষ্ট পণ্ডিত, গবেষক, প্রাবন্ধিক, কবি, ভাষাবিজ্ঞানী ও অনুবাদক রূপে শিশিরকুমার দাশের দেশ-বিদেশ জোড়া খ্যাতি তাঁর নাট্যকার পরিচিতিকে অনেকটাই ম্লান করে রেখেছিল। এ নিয়ে তাঁর মনেও জমা হয়েছিল ক্ষোভ, অভিমান। চিন্ময় গুহ'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উনি স্পষ্টই বলেছিলেন, "কলকাতায় চাকরি জুটল না।... এটাও বুঝলাম যাকে আপনারা সৃজনশীল সাহিত্য বলেন, সে-জগতের প্রবেশদ্বারগুলিও মোটামুটি বন্ধ হয়ে গেছে। আমি লেখা পাঠালে কেউ যে ছাপতেন না তা নয়, ছাপতেন, কিন্তু উত্তাপ ছিল না তাঁদের ব্যবহারে, আন্তরিকতা দূরের কথা। একটা উপেক্ষা, একটা উদাসীনতা আমাকে পীড়িত করত।"[১] এই প্রেক্ষাপটে শিশিরকুমারের মৃত্যুর আট বছর পর নবকলেবরে, 'কারিগর' থেকে প্রকাশিত হলো নাটকের বই 'অলৌকিক সংলাপ'— দশটি সংলাপ — ছোটো ছোটো নাটক। চরিত্রগুলি গ্রিক সাহিত্য ও ভারতীয় সাহিত্য থেকে নেওয়া। শিশিরকুমার দাশের কথায় — "গ্রিক ও ভারতীয় নামক চিন্তাভাবনার

তুলনামূলক আলোচনা এর লক্ষ্য নয়, তার যোগ্যতাও আমার নেই, কিন্তু একটি গ্রিক ও একটি ভারতীয় চরিত্রকে মুখোমুখি এনে আমি চেষ্টা করেছি একটা নাটক তৈরি করতে, যার মধ্যে আছে দুটো ভিন্ন পুরাণ, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, ভিন্ন ধরনের আততি।"[২]

অলৌকিক সংলাপের মধ্যে একটা নাট্য-পৃথিবী এঁকেছেন শিশিরকুমার দাশ। তা যতটা গ্রিক, যতটা ভারতীয়, তার চেয়েও অনেক বেশি সাহিত্যের। 'অলৌকিক সংলাপ' একাধারে সাহিত্যিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিক শিশিরকুমার দাশের মৌলিক মনন চিন্তার রসাশ্রয়ী। উৎসর্গ পত্রে বন্ধু অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে লিখেছেন,

"এসব কথা নিতান্ত লৌকিক
না ছন্দসী না গায়ত্রী গ্রীক
কিন্তু তোমার স্পর্শ পেলে
সংলাপে রঙ লাগে অলৌকিক।"[৩]

রচনার পটভূমি বর্ণনার মধ্যেও মিশে আছে এক নাটকীয় রসিকতা, "এক ভারততত্ত্ববিদের কাছ থেকে এই সংলাপটি পাওয়া গেছে। তিনি দাবি করেন এই পাণ্ডুলিপিটি অতি প্রাচীন। সংস্কৃত এবং গ্রিক ভাষার মিশ্রণে এটি লেখা হয়েছিল। তিনি প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রস্তুতি করেছিলেন কিন্তু কোনো পত্রিকাই প্রকাশ করতে রাজি হননি। তার প্রধান কারণ অবশ্যই পাণ্ডুলিপিটির প্রতি সন্দেহ। বিশেষ ভারততত্ত্ববিদটি একটি উন্মাদনায় দিন যাপন করছিলেন। সম্প্রতি তিনি দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছায় আমি রচনাটি বাংলায় অনুবাদ করছি। মূল পাণ্ডুলিপিটি দুর্ভাগ্যবশত, বিনষ্ট হয়ে গেছে। — লেখক।"[৪] 'অলৌকিক সংলাপ' (দশটি পৃথক কথোপকথন) অপরিসীম পঠন-পাঠন ও পাণ্ডিত্যের মননের ছাপ! বিশ্বের ধ্রুপদী সাহিত্যের মহাকাব্যের মধ্যে নিমজ্জিত এক প্রাণ যেন!

গ্রিক চর্চার শ্রেষ্ঠ ভাবনা-উদ্দীপক ফসল অলৌকিক সংলাপ। কিন্তু কিভাবে শুরু হয়েছিল এই সংলাপ? উত্তরে চিন্ময় গুহকে জানিয়েছিলেন শিশিরকুমার দাশ — "গ্রিকনাটকগুলি যে আমাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল, এখনও দেয় তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গ্রিক নাটকের প্রতি আমার যে সাড়া তা নিতান্তই স্বাধীন। স্কুলে-কলেজে আমি গ্রিক নাটক পড়িনি, কোনো মনীষী কী বলেছেন তা আমি জানতে বাধ্য হইনি। 'প্রমেথেউস বাউন্ড' অনুবাদ করেছিলাম নিতান্তই আনন্দে, নাটকটি পড়ে একটা আলোড়ন হয়েছিল। তারপর থেকে অন্যান্য নাটক পড়েছি। কোনো কোনো নাটক বহুবার পড়েছি। শুধুই স্বাধীন পড়া। পড়তে পড়তে গ্রিক নাটক সম্বন্ধে, আর নাটকের থেকে উৎসারিত জীবনবোধ সম্বন্ধে ভেবেছি। লক্ষ্য করেছি ভারতীয় জীবনবোধের সঙ্গে তার মিল, তার অমিল। তারপর অবশ্য বয়স বেড়েছে, গ্রিক সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বইও পড়েছি। এই সমস্ত কিছু মিলে অনেকদিন ধরে মনের গভীরে একটা প্রক্রিয়া চলছিল নিশ্চয়ই। একবার The Statesman পত্রিকায় চার-পাঁচটা ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখেছিলাম গ্রিক সাহিত্য নিয়ে- সাফো, প্লেটো, সোলনকে নিয়ে — আবার কাসান্দ্রা, ইফিগেনেইয়া কিংবা ওইদিপৌসকে নিয়ে। হঠাৎ একটা সেমিনারে আমন্ত্রণ এল ভারতীয় সাহিত্যে ট্রাজেডি বিষয়ে। কথোপকথনের আকারে আমি লিখে ফেললাম আমার বক্তব্য। স্বর্গে ট্রাজেডির উৎস। বিশ্বের সব নাট্যকাররা সেখানে সমবেত। গ্যেটে জোর করে কালিদাসের শকুন্তলাকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন উৎসবে। অ্যারিস্টটল এই নাট্যোৎসবের বিচারক। শকুন্তলার অভিনয় দেখে তিনি কালিদাসকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এই আমার অলৌকিক সংলাপের শুরু। তারপর, বোধহয় তিন বছর ধরে আরো নটি সংলাপ — ছোট ছোট নাটক।"[৫]

আধুনিক নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে অলৌকিক সংলাপ তার বয়ানে, ভাষ্যে, চরিত্রে স্বাতন্ত্র্যের শ্রেষ্ঠ দাবিদার। প্রাচীন কণ্ঠস্বরকে শিশিরকুমার দাশ রুদ্ধ করেননি, তাই প্রাচীন হয়ে উঠেছে আধুনিক। ক্লাসিকে যে আমাদের বারবার ফিরে যেতে হয় সে আমাদেরই সময়ের তাগিদে। আর একথাটাকে সঞ্জীবনীর মতো কাজে লাগাতে ছদ্ম অহঙ্কারে শিশিরকুমার লেখেন:

"আমি কোনো প্রাচীন কবির কাছে
গিয়েছিলাম নবীন অহঙ্কারে,
বসেছিলেন একেবারেই একা
অমরত্বের আদিম অন্ধকারে।
ছুঁড়ে দিলাম কবির মুখে সজোরে এই কথা

'আমাকে তাঁর দেবার কিছু আছে?'
আসনখানি এগিয়ে দিয়ে হেসে
বলেছিলেন তিনি
'নীরবতা'।"[৬]

সেই নীরবতার উত্তরাধিকার হাতে নিয়েই তিনি কথা খুঁজতে চলেন। পিছিয়ে চলে যান বহুযুগের ওপারে। স্থান-কাল-ভূগোল ভুলে তিনি কখনো পৌঁছে যান ট্রয়ে, স্কামান্দ্রস নদীর তীরে, কখনো বা মহাভারতের ভারতবর্ষে, কখনো বা রবি ঠাকুরের 'ডাকঘরে'। সাহিত্যের মানচিত্রহীন পৃথিবীতে রচিত হয় 'অলোকিক সংলাপ' — এক স্বপ্নময়, স্বতন্ত্র নাট্যভাষ্য।

২

গ্রিক মননের সঙ্গো শিশিরকুমার দাশের অন্বয় কোনো আলতো ব্যাপার নয়, এক বড়ো প্রকল্পের অন্তঃসার তার মধ্যে নিহিত। আর কিছু না হোক, শুধুমাত্র কাজের পরিমাণগত বিচারেই তা টের পাওয়া যায়। তাঁর অনুবাদচর্চার মধ্যে আছে আরিস্ততলের 'কাব্যতত্ত্ব', সোফোক্লেসের 'রাজা ওইদিপৌস' ও 'আন্তিগোনে', এউরিপিদেশের 'বন্দিনী' এবং প্রাচীন গ্রীক কবিতার অনুবাদ সংকলন 'বহু যুগের ওপার হতে'। তবে, গ্রীক অনুরাগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'অলৌকিক সংলাপ' — যা শিশিরকুমার দাশের গ্রীক অনুরাগের পারদ স্পর্শ ছাড়া বোঝা প্রায় অসম্ভব।

গ্রিকনাটকগুলি ছাত্রাবস্থায় শিশিরকুমার দাশের সাহিত্যিক মননকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্র থাকাকালীন হিন্দু হোস্টেলের লাইব্রেরিতে তিনি পেয়েছিলেন ইস্কিলাসের প্রমেথেউস বাউন্ড। সেই প্রথম তাঁর গ্রিক নাটক পড়া এবং মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাওয়া। এই মন্ত্রমুগ্ধতার রেশ ছিল আমৃত্যু। শিশিরকুমার দাশের কথায় — " 'প্রমেথেউস বাউন্ড' অনুবাদ করেছিলাম নিতান্তই আনন্দে, নাটকটি পড়ে একটা আলোড়ন হয়েছিল। তারপর থেকে অন্যান্য নাটক পড়েছি। কোনো কোনো নাটক বহুবার পড়েছি। শুধুই স্বাধীন পড়া। পড়তে পড়তে গ্রিক নাটক সম্বন্ধে, আর নাটকের থেকে উৎসারিত জীবনবোধ সম্বন্ধে ভেবেছি। লক্ষ্য করেছি ভারতীয় জীবনবোধের সঙ্গো তার মিল, তার অমিল।"[৭] গ্রিকভাষা শেখার সূচনা ঘটে ১৯৬৬ সালে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে তা সম্পূর্ণতা পায় মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে একটা Summer Schoolএ প্রাচীন ভাষাশিক্ষার একটি intensive courseএ যোগ দেন শিশিরকুমার দাশ। সেখানে পরিচয় ঘটে প্রাচীন গ্রিকের মহাপণ্ডিত অধ্যাপক এলস্ এর সঙ্গো। পোয়েটিক্স্-এর অনুবাদক অধ্যাপক এলস্-এর ক্যাথারসিস তত্ত্ব নিয়েও বই ছিল। তিনি তাঁকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, Didn't the British introduce Greek in India? উত্তরে শিশিরকুমার দাশ জানিয়েছিলেন, It was Alexander who did it· মিসিগানে তিন মাস গ্রিক শেখার পর কর্নেলে ফিরে গ্রিক ক্লাসে ভর্তি হন শিশিরকুমার দাশ। প্লেটোর 'সক্রেটিসের জবানবন্দী' এবং ইউরিপিদেসের 'বাক্‌খাস' দিয়ে শুরু হয়। পরে ইলিয়ডের একটা সর্গ পড়েন। কর্নেল থেকে ফিরে এসে ব্যাকরণ, অভিধান, টীকা-টিপ্পনী সম্বল করে নিজে নিজেই গ্রিকচর্চা চালাতেই শিশিরকুমার দাশ। চিন্ময় গুহকে সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন তিনি: "একটা ঘটনা বলি। গ্রিক ক্লাসে কাজ ছিল অনুবাদ করার। মূল বইটি সামনে রেখে ইংরেজিতে অনুবাদ করা। সবাই বাড়ি থেকে ইংরেজি অনুবাদ করে নিয়ে আসত। আমিও অনুবাদ করতাম তবে বাংলায়। আমার turn এলে বাংলা অনুবাদটা সামনে রেখে ইংরেজিতে বলে যেতাম। আমাদের গ্রিক শিক্ষক একদিন একটু কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার হাতের লেখাটা তো ইংরেজি নয়'। তাঁকে যখন বুঝিয়ে বললাম তখন তিনি খুব মজা পেয়েছিলেন তিনি।... প্লেটোর লেখাটা এমনই নাটকীয় যে আমি ওরই ভিত্তিতেই পরে 'সক্রেটিসের জবানবন্দী' নামে একটা একাঙ্ক নাটক লিখে ফেলেছিলাম। বাক্‌খাস্-ও অনেকটা অনুবাদ করেছিলাম হোমটাস্ক হিসেবেই।"[৮]

'অলৌকিক সংলাপে' তাই বারবার ফিরে ফিরে আসে গ্রিস। গ্রিসের জনজাতি, অভিরুচি, প্রকৃতি। বস্তুত শিশিরকুমার নতুন নতুন সংযোগের সম্ভাবনাই সন্ধান করেন তাঁর পুনঃপাঠে, ভাষ্যে, লিখনবিশ্বের স্থাপত্যে। এবং, তিনি ভোলেন না যে ধ্রুপদী গ্রিসেরও ছিল সমান্তরাল এক অপার পরিসর: "সে জগৎ সাধারণ মানুষের, সেও এক বহুবর্ণ, বহুস্বর, বহুগন্ধস্পর্শময় জগৎ। যে জগতের উপাদান ভালোবাসা, ঈর্ষা, কলহ, পরিহাস, বিস্ময় — ছোটো সুখ ছোটো দুঃখের জগৎ।"[৯] এই জগতের দিকে তর্জনি সংকেত করেন যিনি, সেই ধ্রুপদী বিদ্যায় পারঙ্গাম প্রাজ্ঞজনকে বুঝে নিই মানুষরতনের খোঁজে কাল থেকে কালান্তরে বেরিয়ে পড়া এক চিরপথিক বলে।

© Santiniketan Sahityapath

শিশিরকুমার দাশ বারবার ফিরে তাই ফিরে যান সমসময়কে ধরবার জন্য। ওই যে প্রাচীন কবির কাছে নীরবতার উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন তিনি, সেই পুঁজি সম্বল করে এগিয়ে চলে তার সময়সন্ধিৎসা। 'বহু যুগের ওপার হতে' নামের গ্রিক কবিতার অনুবাদ সংকলনের ভূমিকায় তিনি লেখেন, "সেই গ্রিস লুপ্ত, তবু মানুষের স্মৃতিলগ্ন; সেই গ্রিকভাষা লুপ্ত, তবু তারই পরিবর্তিত রূপ এখনও প্রবহমান। সমস্তই হারায় নি, মানুষের ইতিহাসে সবই আছে; স্মৃতির সুদূরতম তটে এখনও সুদূরতম অতীত প্রাণময়। তাই সেই গ্রিস সুদূর, কিন্তু অনায়ত্ত নয়; প্রাচীন, এ প্রাচীন নয় চিরমৌন। কালের ব্যাবধান, চিন্তার ব্যাবধান, নানা সমুদ্র নদী প্রান্তরের ব্যবধান সত্ত্বেও এ প্রাচীনের কণ্ঠস্বর এখনও ভেসে আসছে। গ্রিক কবিতার জগৎ পুরোটা আমাদের চেনা নয়। তার সংস্কৃতির, তার সংস্কারের অনেকটাই আমাদের অচেনা। কোন বিদেশের কবিতার জগৎ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ চেনা? কিন্তু যা মানুষের সৃষ্টি তা কি আরেকটি মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হতে পারে? গ্রিক কবিতার জগৎ আমাদের অনেকটাই চেনা কারণ তা মানুষের আশানিরাশা দুঃখসুখেরই জগৎ। সেই সুখ-দুঃখের বোধেই তো আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আমরা অবিচ্ছিন্ন। আমাদের কণ্ঠস্বরে আমাদের পূর্বপুরুষেরাও কথা বলেন। প্রাচীন জগতের কবিতা তাই কবিতার প্রাচীন জগৎ মাত্র নয়; চিরকালের বীজ তার মধ্যে সুপ্ত, সে বীজ জেগে ওঠে নতুন জগতের হাওয়ায়, প্রাচীন আর আধুনিককে মিলিয়ে দেয়।"[১০] এই মিলিয়ে দেওয়াই শিশিরকুমারের চর্যা। তাঁর 'প্রাচীন' মুখ ক্লান্তির বিশ্রাম নয়, তা সজীব, বীজময়। সেখানে তাঁর ঋদ্ধির সঞ্চার, সে-ঋদ্ধি থেকে জাত ফসলই 'অলৌকিক সংলাপ।'

দশটা কথোপকথনের সমাহার 'অলৌকিক সংলাপ'কে শিশিরকুমার দাশ নাটকের বই বললেও, এর মধ্যে অন্তর্নিহিত হয়ে থাকে সাহিত্যের একটি তুলনামূলক পাঠ, এমনকি সাহিত্যতত্ত্বও। শুধুমাত্র গ্রিক অনুরাগ নয়, শিশিরকুমার দাসের সাহিত্য-ঐক্য দর্শনের ছাপ থেকে যায় এই নাট্যগ্রন্থে। রঁলা কালিদাস নাগকে চিঠিতে লিখেছিলেন সাহিত্য-শিক্ষণ তুলনামূলক ছাড়া অন্যরকম হতে পারে না। শিশিরকুমার দাশও Compartmentalized সাহিত্য-শিক্ষণকে মনে করতেন অসম্পূর্ণ। তাঁর মতে সাহিত্য-শিক্ষণ বা সাহিত্য পাঠ তুলনামূলক না হলে সম্পূর্ণতা পাবে না। চিন্ময় গুহকে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন: "সেই পুরোনো কথা What does he know of English who only English knows? সাহিত্যের বিভাগগুলি বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে দেওয়াল তুলেছে। এই দেয়াল ভেঙে ফেললে তবেই নতুন চিন্তার হাওয়া খেলবে। মানুষের সৃষ্টিকর্মকে অনেকটা বড় পরিপ্রেক্ষিতে, অনেক বড়ভাবে দেখতে পাওয়া যাবে। একদিন হয়ত একটাই বিভাগ হবে, যার নাম সাহিত্য বিভাগ। স্যাঁত-ব্যেভের একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম, বোধ হয় What is classic? তার মধ্যে আছে সাহিত্যের তীর্থযাত্রার একটা রূপকের খবর। Journey of Magiর ছবি-চলেছেন বাল্মীকি আর বেদব্যাস, সঙ্গে হোমার, তাঁর পেছনে ভার্জিল, তাসো, ফিরদৌসি, আরও কত ছবি। সাহিত্য পাঠের একটা প্রধান লক্ষ্য হল enlargement of taste, আর তার জন্য দরকার তুলনামূলক পদ্ধতি। যতই জানি অন্যকে ততই জানি নিজেকে।"[১১]

শিশিরকুমার দাশ দেখিয়েছিলেন যে সাহিত্যের রুচিসাম্য পাঠসাহিত্যের মাধ্যমেই গড়ে ওঠা সম্ভব। সাহিত্যের আসরে যাঁরা জড়ো হন তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি রসবোধ একস্তরের না হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে একটা ঐক্য থাকে। সেই ঐক্যটা শুধু সামাজিক ঐক্য নয়। সাহিত্যরুচির ঐক্য, একটা বিশেষ চিহ্নসংকেত অর্থময় জগতের অধিবাসীত্বের ঐক্য। ভাষা-দেশ-জাতি ভিন্ন হয়েও সাহিত্যরুচির সমতা সেখানে ঐক্য তৈরি করে। তাত্ত্বিক মহলে এ প্রশ্ন উঠতে পারে অলৌকিক সংলাপ-এর দশটি সংলাপ আদৌ নাটক কিনা! সংলাপগুলি কি আদৌ নাট্যগুণসম্পর্ক? এ প্রশ্ন ওঠাটা অনভিপ্রেত নয়। সাহিত্য যখন খোপে ঢুকে পড়াকেই তার সারসত্য হিসেবে মেনে নেয়, তখন এই ধরনের ব্যতিক্রমী সাহিত্য পড়ে বিপদে। নাটক হতে গেলে তো তাকে নাটকের প্রথাগত 'ব্যাকরণ' মেনে কোনো একটি নাটকের শ্রেণিবন্ধ লাইনে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। অনেক সাহিত্যতাত্ত্বিকের মতে অলৌকিক সংলাপ নাটকই নয়! শিশিরকুমার দাশ 'অলৌকিক সংলাপ' কে নাটকের বই বলেই চিহ্নিত করেছিলেন — যদিও এই যুক্তিতে অলৌকিক সংলাপ নাটক হয়ে উঠতে পারে না। যতই নামকরা লেখক কেউ হন না কেউ, কেউ যদি একটা গল্প লিখে তাকে 'উপন্যাস' বলে দাবী করতে চান — তাহলে সেই 'গল্প'টা কি 'উপন্যাস' হয়ে ওঠে? অলৌকিক সংলাপ আদৌ নাটক কিনা তা বুঝতে গেলে প্রথমেই বুঝে নিতে হবে নাটক সম্পর্কে শিশিরকুমার দাসের মূল্যায়নের রূপরেখা।

চিন্ময় গুহকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে শিশিরকুমার দাসের নাট্যভাবনা: "সাধারণত যাকে action বলা হয়, আমি এড়িয়ে চলি, Climax সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচলিত আছে আমি তা বদলাবার চেষ্টা করি। ছোটো মুখে বড় কথার মত শোনাবে, আমি করছি নাটকের গঠনের পরম্পরার পরিবর্তন আনার। এ হল আমার চেষ্টার কথা। ধর্মীয় ভাষায় বললে সাধনার কথা, সিদ্ধির কথা নয়।

© Santiniketan Sahityapath

কোনো একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা কোনও একটা ঘটনা, সে বর্তমান কালের হোক বা অতীত কালের হোক, আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঙ্গো যুক্ত হোক, অথবা আমার পাঠলব্ধ হোক, যখন আমাকে তীব্র নাড়া দিতে থাকে তখনই আমার নাটকের সূচনা। আমি তাকেই রূপায়িত করতে চাই।”[১২] নাটক কতটা লেখকের কতটা নাট্যকারের? কতটা পাঠের কতটা মঞ্চের? এ প্রশ্নেরও উত্তর মেলে তাঁর জবানবন্দীতে: “অবশ্যই নাটক যেমন মঞ্চের, নাটক তেমন পাঠেরও। পৃথিবীর বহু নাট্যকারের নাটক আমরা কখনোই দেখিনি, কিংবা কদাচিৎ দেখতে পাই। আর যে নাটক মঞ্চে দেখা গেল না তাকে কি উপেক্ষা করব? দেখা গেল না বলে পড়ব না?... আমার কাছে নাটকের পাঠ্য অস্তিত্ব অত্যন্ত মূল্যবান। মঞ্চের নাটক যতটা নাট্যকারের তার চেয়ে বেশি পরিচালকের, পাঠ্য-নাটক নাট্যকারের একার যদি নাও হয় (পাঠক-পাঠিকার ভূমিকা তো আছেই), অনেকটা তাঁরই। তার মানে এই নয় যে আমি মঞ্চের গুরুত্ব কমাবার চেষ্টা করছি। না, সে মূঢ়তা আমার নেই। শুধু বলতে চাইছি নাটকের মঞ্চ নিরপেক্ষ একটা অস্তিত্ব আছে। আছে বলেই যেসব নাটক আমরা কোনোদিন মঞ্চে দেখিনি তারাও আমাদের কাছে মূল্যবান।”[১৩]

অলৌকিক সংলাপের দিকে তাকালে দেখা যাবে নাটক action প্রধান নয়, ভাবপ্রধান। চিরাচরিত ‘climax’ এর ধারণাও মিলবে না অলৌকিক সংলাপে। যে জগতকে পাওয়া যায় অলৌকিক সংলাপে, তা আমাদের চেনা পরিচিত ভূগোলের জমি নয়। কালের গণ্ডী পেরিয়ে সাহিত্যের এক স্বপ্নময় জমিতে আমাদের পৌঁছে দেয় অলৌকিক সংলাপ। ‘Action’ দিয়ে যদি নাটকের সার্থকতা বিচার্য হয়, তবে বাংলা নাটকের ভোল বদলে দেওয়া রবি ঠাকুরের ‘রক্তকরবী’, ‘ডাকঘর’, ‘গুরু’, ‘মুক্তধারা’ — প্রভৃতি কি নাটকের তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাবে? রক্তকরবীর যে দেশ, সেও তো চিন্তা দিয়ে গড়া এক বিমূর্ত ভূখণ্ড মাত্র! Action নির্ভর নাটকের যে ধারা তা আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যাশ্রয়ী নয়। তা নাহলে ভারতীয় সাহিত্যে নাটককে কেন বলা হত ‘দৃশ্যকাব্য’? অলৌকিক সংলাপ তাই শুধুমাত্র নাটকই নয়, নাটকের প্রচলিত ঘরানা থেকে বেরিয়ে পড়া একটি ব্যতিক্রমী নাট্যভাবনা।

৩

শিশিরকুমার দাশের ধ্রুপদী গ্রিক চর্চা তাঁকে কখনো সরিয়ে নিয়ে যায় না আবহমান ভারতবর্ষ থেকে। অলৌকিক সংলাপে মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দেন গ্রিক পুরাণ ও ভারতীয় পুরাণ থেকে বেছে-তোলা নিয়তিসাযুজ্যে জোড় মেলানো অসহায় পাপী দুঃখী ক্লেশজর্জরিত মানুষদের। তারা তাদের নিজেদের হিসেব মেলায়, আক্ষেপ জানায়, বিলাপ করে, কখনো অভিযোগ উদ্যত হয়ে ওঠে, আর সেই আসরে আমরা দেখে নিতে পারি আমাদের অনিবার্য কালপ্রতিমা। আরিস্ততল ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’এ নাটক খুঁজে পান না, কারণ কোথাও কোনও নাট্য-সংঘাত নেই। আর কালিদাস বোঝাতে চান, ‘আমার নাটকের কেন্দ্রে আছে দুই বিরোধী শক্তির সমন্বয়, সংঘাত নয়।’[১৪] ‘তিন অন্ধ’ সংলাপে কুশীলব ধৃতরাষ্ট্র, ওইদিপৌস ও তেইরেসিয়াস। প্রথম দু’জনেই মর্ত্যজীবনে রাজা ছিলেন। এক জন জন্মান্ধ, অন্য জন স্বেচ্ছা-অন্ধত্ব বরণ করে নিয়েছেন নিজের চরম পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে। তৃতীয় জন ত্রিকালজ্ঞ মহাজ্ঞানী, যিনি নারীদেহের প্রতি অসংগত কৌতূহলে স্বর্গের সম্রাজ্ঞী হেরা-র রোষে প্রথমে এক নারীতে রূপান্তরিত হন ও পরে পুনরায় পুরুষদেহ ফিরে পান, কিন্তু অন্ধত্বের অভিশাপ-সহ। এঁদের ত্রিকোণ সংলাপ দেশ-কাল, সভ্যতা-বর্বরতা, দেবলোক-মর্ত্যলোক সংক্রান্ত জটিল সব প্রশ্ন তুলে ধরে। ঠিক তেমনই ‘দুই মাতৃঘাতী’তে পরশুরাম ও ওরেসতেস, ‘মৃত্যুলোকে সশরীরে’তে সাবিত্রী, বেহুলা ও এউরিদিকে এই তিন নারী, ‘দুই অতিথি’তে দেবরাজ ইন্দ্র ও ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিস, ‘দুই বৃদ্ধ’তে প্রিয়াম ও ধৃতরাষ্ট্র, ‘তরুণ তরুণী’তে অভিমন্যু ও ইফগেনেইয়া, ‘উর্বশী ও আর্তেমিস’, ‘তিন বন্দিনী’তে রাম, পেনেলোপি ও হেলেন, ‘দুই বালক’এ অমল ও আসতুয়ানাক্স-এর কাহিনির পর কাহিনিতে দুই প্রাচীন সভ্যতার পুরাণ-গাথাগুলি যেন নতুন রূপে জীবন্ত উঠে আসে। সংলাপ শেষ হয়ে গেলে কানে বাজতে থাকে এমন সব অসাধারণ উচ্চারণ: ‘দেবতাদের বিশ্বাস করতে ভয় হয়। তাঁরা যে বড় কৌশলী। তাঁদের উপহারের মধ্যে থাকে উপহাস, করুণার মধ্যে থাকে অবহেলা, উদ্ধারের মধ্যে উপেক্ষা।’[১৫]

‘নাটক বিচার: কালিদাস ও অ্যারস্টট্‌ল’নাটকে উঠে এসেছে ট্রাজেডি তত্ত্ব। সংলাপের দ্বন্দ্বযুদ্ধে মেতে ওঠে দুটি ভিন্ন সময়ের, দুটি ভিন্ন দেশের খ্যাতনামা দুই পণ্ডিত কালিদাস ও অ্যারস্টট্‌ল। ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’কে ট্রাজেডি হিসেবে মানতে চাননি অ্যারস্টট্‌ল। যেভাবে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ শুরু হয়েছে, তাকে তীব্র কষাঘাত করে অ্যারস্টট্‌লের যুক্তি, ‘আমি যদি বলি, নাটকটা শুরু হওয়া উচিত ছিল শকুন্তলার রাজসভায় আসার সময় থেকে, তাহলে কি অন্যায় হবে?’[১৬] কিংবা, ‘তোমার প্রথম চারটি অঙ্ক যে নাটকটিতে কেন রেখেছ তা তো আমি বুঝতে পারছি না।’[১৭] ট্রাজিডি সম্পর্কে অ্যারস্টট্‌লের যে ধারণা ছিল, তা মিলে মিশে লীন হয়নি অভিজ্ঞানশকুন্তলমে।

© Santiniketan Sahityapath

তাই এই বিরোধ। তবে, নাটকটি পড়তে পড়তে জানা যায় যে বিরোধ যে এই প্রথমবার ঘটেছে তা নয়, আগেও 'সোফেক্লেস'এর একটি নাটককে ঘিরে ঘনীভূত হয়েছিল সংঘাত, 'সেটা একটা ট্রাজেডি, কিন্তু সেই ট্রাজেডির শেষটা বেদনার নয়, বিচ্ছেদের নয়, হাহাকারের নয়। আমরা ট্রাজেডি বলতে যা বুঝি তার মধ্যে বিচ্ছেদ, মৃত্যু, সর্বনাশ একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে। বিশেষ করে সমাপ্তিতে। ট্রাজেডি বলতে বুঝি মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন-ভালো থেকে মন্দে, সুখ থেকে দুঃখে, প্রতিষ্ঠা থেকে অবসানে। অথচ সেই নাটকে একটি অপবিত্র নায়ক পরিণত হল পবিত্র সত্তায়; এক মরণশীল মানুষ পেয়ে গেল অমরত্বের অংশ।''[১৮] যন্ত্রণা যেখানে শেষকথা নয়, তাকে ট্রাজেডি হিসেবে অস্বীকার করেন অ্যারিস্টটল। কালিদাস জানান নাটকের ক্রিয়া সম্পর্কে তার ভিন্ন মতামত। এই নাটকেও তিনি একটি মাত্র ক্রিয়াকে মাঝখানে রেখে চলেননি। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'এর কেন্দ্রে আছে দুই বিরোধী শক্তির সমন্বয়, সংঘাত নয়। কালিদাস জানান: ''আমার ধারণার মধ্যে যন্ত্রণাই শেষ কথা নয়।... জীবন একটা প্রবাহ, সেখানে সুখ এবং দুঃখ, আর্তনাদ এবং আহ্লাদ ঢেউয়ের মতো। শেষই সমাপ্তি নয়, সে আর এক আরম্ভের মধ্যে বিলীন।''[১৯] শিশিরকুমার দাশ এই নাটকে ট্রাজেডির ব্যাকরণ নিয়ে কোনো সার্বিক সত্যে পৌঁছতে চাননি, তিনি কালিদাস ও অ্যারস্টটলকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে শত দ্বন্দের পরেও জিতিয়ে দিতে চেয়েছেন নাটককে। ব্যাকরণ তার লক্ষ নয়, উপজীব্য নাটকের উপভোগ্যতা। অ্যারস্টটল-এর শেষ সংলাপেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে — ''এখনও আমার ধারণা তোমার নাটক নাটকই নয়। কিন্তু আমি আর নাটকের বিচার করতে চাই না, আমি উপভোগ করতে চাই। এই আমার সিদ্ধান্ত।''[২০]

'তিন অন্ধ' নাটকে উঠে আসে গ্রিকরাজ ওইদিপৌস, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র, গ্রিক ত্রিকালজ্ঞ তেইরেসিয়াসের জীবন জিজ্ঞাসা। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কেবলমাত্র জন্মান্ধ ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন স্নেহে অন্ধ, মোহে অন্ধ। তাঁর এই অন্ধত্বই সংগঠিত করেছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের — যার ফলস্বরূপ অজস্র মৃতের আহত বুকের উত্তপ্ত রক্তের গন্ধ পেয়েছিলেন কুরুরাজ। ওইদিপৌসের নাম প্রকৃতপক্ষে নাম নয়, ক্ষতচিহ্ন, অসম্মান, তা নামহীনতা। ওইদিপৌস যে অন্ধকার উন্মোচন করতে চেয়েছিলেন সেই উন্মোচনের শেষ তাঁর অন্ধত্বে। আর, তেইরেসিয়াস জেউসের স্ত্রী হেরাকে কামনা করার অভিশাপে পেয়েছিলেন নারী শরীর। এরপরে একদিন, জেউস আর হেরা যখন তাঁকে ডেকে জানতে চান নারী ও পুরুষের সঙ্গমে কার তৃপ্তি বেশি, যখন তার উত্তর হয় 'নারী', তখন দ্বিতীয়বার অভিশাপে তেইরিয়াস পায় অন্ধত্ব ও পুনরায় পুরুষ শরীর। তিন অন্ধ, তাঁদের বিচিত্র জীবন জিজ্ঞাসাকে, জীবনের ক্ষতগুলোকে নিপুণ ভাবে নাটকে বুনে দেন শিশিরকুমার দাশ। ওইদিপৌস যখন কুরুরাজকে বলেন — 'আমি অন্ধ, এই আমার বর্তমান। আমি চক্ষুষ্মান, এই আমার অতীত। সংগ্রাম চলছে আমার অন্ধত্বে ও আমার দর্শনশক্তিতে। সে কি সৌভাগ্য, কুরুরাজ?'[২১] কিংবা যখন বলেন — 'অন্ধ চোখের মধ্যেও জ্বলজ্বল করে স্মৃতিবিদ্ধ রূপলোক। কী কঠিন যন্ত্রণা। একটি ইন্দ্রিয় আছে অথচ নেই। এ কি সৌভাগ্য? এ কি দুর্ভাগ্য?'[২২] — তখন পাঠকমনেও অনুভূত হয় স্বেচ্ছান্ধের জীবন যন্ত্রণা। একই সূত্রে মিশে যায় গান্ধারীর স্বামীর জন্য অন্ধত্ব বরণের দগদগে ক্ষতচিহ্ন। তেইরেসিয়ানের জবানিতে শিশিরকুমার মিশিয়ে দেন Gender, Sexuality এবং অন্ধত্বের প্রশ্নমালাকেও — 'তুমি বলেছ ওইদিপৌস, তুমি অন্ধ তবু তোমার মধ্যে বেঁচে আছে চক্ষুষ্মানের সব স্মৃতি। আমি নারী অথচ পুরুষেরও।'[২৩]

এরপরের নাটকে মুখোমুখি দাঁড়ায় দুই 'মাতৃঘাতী' — পরশুরাম ও ওরেসতেস। গ্রিসের আর্গোস রাজ্যের রাজা আগামেমনান ছিলেন ওরেসতেসের পিতা। তাঁর কাকার নাম মেনেলাউস, যাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ট্রয়ের সর্বনাশা যুদ্ধ — বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী-হেলেন। আগামেমনান যখন যুদ্ধে ব্যস্ত তখন আয়গিসথুস নামে এক যুবকের সঙ্গো প্রণয়ে আবদ্ধ হন তাঁর মা। তাঁর মা এবং আয়গিসথুস মিলে একদিন স্নানাগারে গোপনে হত্যা করেন আগামেমনানকে। ওরেসতেস দেশে ফিরে বোনের মুখে তা জানতে পেরে পিতৃহত্যার প্রতিশোধকামনায় হত্যা করেন নিজের মাকে। নাটকে উঠে আসে পরশুরামের মাতৃঘাতী হওয়ার বৃত্তান্তও। পরশুরামের জননী রেণুকা যেদিন রাজা চিত্ররথকে দেখে কামার্ত হয়ে উঠেছিলেন, সেদিন পরশুরামের পিতা নিজ স্ত্রীর এই আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে, এই অধীর, শীলতাবর্জিত নারীকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন পুত্রদের। অন্য চার ভাই অমান্য করে পিতার অভিশাপে পরিণত হলো পশু পাখিতে আর পরশুরাম মাতৃহত্যা করে পরিণত হলেন বর্বর মানুষরূপী পশুতে। এই নাটকে দুজন মাতৃঘাতীর জীবনকথা যেমন উঠে এসেছে, তেমনি উঠে এসেছে সমাজের 'পিতৃতান্ত্রিক' চরিত্র। দুজন মাতৃঘাতীকে সামনে রেখে শিশিরকুমার দাস পাঠক মনে প্রশ্ন তুলেছেন 'পিতার আদেশ' ও 'মাতৃরক্ষার' ঔচিত্যবোধকে! দুটি চরিত্রই কেবল পিতার কথা শুনেছে, কেউই শুনতে চায়নি মায়ের কথা। এটা কি কালের গর্ভে লুকিয়ে থাকা পিতৃতন্ত্রের জাঁতাকল নয়? পরশুরামের মুখে নাটকের নাট্য দ্বন্দটি প্রতিষ্ঠা করে যান শিশিরকুমার দাশ- 'একজন জনক, একজন জননী। একজন বীজ, একজন প্রান্তর। কার কাছে বেশি আনুগত্য শস্যের?'[২৪]

 © Santiniketan Sahityapath

'মৃত্যুলোকে সশরীরে' পৌঁছে যায় তিন স্বামী-হারানো নারীর যন্ত্রণা এবং যন্ত্রণা মুক্তির কথা। না, স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, স্বামীদের উপর নেমে এসেছিল দৈব অভিশাপ। আদিত্যবর্ণ, ভয়ংকর মৃত্যুদেবতাকে সেদিন ভয় পাননি স্বামী-হারানো সেই নারীরা — সাবিত্রী, এউরুদিকে ও বেহুলা। বরং ভালোবাসাকে অস্ত্র করে এক জেহাদি স্লোগানে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল দৈবের বিরুদ্ধে। একদিকে সর্বশক্তিমান দৈব, তাঁর নিষ্ঠুরতা; অন্যদিকে খড়কুটোর মতন ভেসে চলা ভালোবাসা। শেষ যুদ্ধে জিতেছিল ভালোবাসাই। সাবিত্রী ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন সত্যবানের প্রাণ। বেহুলা জিতে নিয়েছিলেন লখিন্দরের প্রাণ। কেবলমাত্র অরফেউস স্বর্গ অবধি এসেও নিয়ে যেতে পারেনি এউরুদিকেকে। এউরুদিকে যখন বলে — "তোমরা যাও, বেহুলা, সাবিত্রী। আমি থাকি এইখানে, এই রক্তাক্ত নদীর তীরে বসে অপেক্ষা করি খণ্ডছিন্ন অরফেউসের। আমি মৃত্যুপুরীর প্রহরী।'[২৫] তখন সাবিত্রী বলে ওঠে — 'না, মৃত্যুপুরীতে তুমি জীবনের একমাত্র প্রতিনিধি।'[২৬] দুটি ভিন্ন দেশের, ভিন্ন সময়ের তিন নারীর একই সুরে কেঁদে ওঠে, একইভাবে ভালোবাসা এবং ভালোবাসার জীবন-যুদ্ধে একই ভাবে লড়ে চলার সমীকরণটি বুনে দেন শিশিরকুমার দাশ। প্রমাণিত হয়, পৃথিবীর সব মানুষের ভালোবাসার পৃথিবী আসলে এক আকাশের নিচে।

'দুই অতিথি' নাটকে পাঠকের সামনে আসে ইন্দ্র ও প্যারিস। একদিকে স্বর্গরাজ ইন্দ্র, অন্যদিকে আলেকজেন্ডার প্যারিস যার জন্য ট্রয়ের ধ্বংস, হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু, শত শত নাবিকের আর্তনাদ, শত জাহাজের অবসান। এদিকে গৌতমের অভিশাপে ইন্দ্রের সামনেও এক ধু-ধু প্রাণহীন মরুভূমি। দুই নারী এবং তাঁদের প্রতি ভালোবাসাই সম্মুখীন করেছে ইন্দ্র ও প্যারিসকে এক অভিশপ্ত রাজ্যের সম্মুখীন হতে। আতিথ্যের নিয়ম, গৃহের নিয়ম ভেঙে প্যারিস প্রেমে পড়েছিল হেলেনের আর ইন্দ্র গৌতমীর। তাঁরা মানেনি কোনও কিছুর অলঙ্ঘনীয়তা, কোনো কিছুর অনড় পবিত্রতা, কোনো সম্পর্কের চিরস্থায়িত্ব। তারা শুধু ভেসে গিয়েছিল প্রেমের অলকানন্দা জলে। আজকের মতোই সেদিনকার সমাজ, অনুশাসন প্রেমের বিরুদ্ধে তুলেছিল তীর্যক চাবুক। আজকের সমাজেও যেখানে প্রেম স্বাধীন নয়, তা যে বহুযুগের ওপার থেকেই প্রবহমান — তা ইঙ্গিত করেন আলোচ্য নাটকে শিশিরকুমার দাশ।

দুই বৃদ্ধ 'প্রিয়াম' ও ধৃতরাষ্ট্র ভর দিয়ে দাঁড়ায় পিতৃহন্তাদের অবলম্বন করে। ইতিহাসের এ এক ভয়ংকর ট্রাজেডি। দুজন বৃদ্ধ দুটি যুদ্ধ সংগঠিত হতে দেখে কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারে না। দুজনের চোখের সামনে মৃত্যু ঘটে নিজ পুত্রদের — তারা তাকিয়ে দেখে। পুত্র দুর্যোধনের সাম্রাজ্যদখলের লোভকে সেদিন স্নেহের বশে প্রতিহত করতে পারেননি ধৃতরাষ্ট্র। পুত্রস্থেহে অন্ধত্ব তাঁকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল শত অন্যায়ের। দ্রৌপদীকে প্রকাশ্য সভায় বিবস্ত্র করা হয়েছিল তাঁর সামনেই। তারপর যুদ্ধ। দুর্যোধন-সহ কুরুবংশের মৃত্যু। এরপর, যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ভ্রাতৃপুত্রদের আসা তাঁরই কাছে আশীর্বাদ কামনায়। আশীর্বাদ চাইছেন তাঁরা, যারা তাঁর পুত্রদেরই হত্যাকারী। এর চেয়ে কঠিন মুহূর্ত আর কিই-বা হতে পারে? অন্যদিকে, প্রিয়ামকেও স্পর্শ করেছিল পুত্রহত্যাকারী আখিলেশ। পুত্র হেকতোরের মৃতদেহ ফিরিয়ে আনতে যখন প্রিয়াম উপস্থিত হয় আখিলেশের রাজসভায়, তখন আখিলেশ তাঁর হাতে এগিয়ে দেয় যুদ্ধজয়ের আনন্দ-সুরা। ধৃতরাষ্ট্র ও প্রিয়াম — দুই হতভাগ্য পিতার জীবন যন্ত্রণার দ্রাঘিমারেখা ছুঁয়ে এই নাটক পৌঁছে যায় এক কঠিন সত্যে — 'আমরা বৃদ্ধ, আমরা অতীত, আমরা যদি সতর্কবাণী না শোনাই বর্তমানকে, তাহলে কে শোনাবে?'[২৭]

'তরুণ তরুণী' অভিমন্যু ও ইফিগেনেইয়া। একজন পুরুষ আরেকজন নারী। দুজনেই যুদ্ধের বলি, চক্রান্তের শিকার। অভিমন্যু চক্রব্যূহে প্রবেশ করার কৌশল জানলেও জানত না চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসার পথ। তারপরেও, তাঁর সামনে সৈনিকের আদর্শ জানান দিয়ে, লুব্ধ করে তাঁকে বাধ্য করা হয় চক্রব্যূহে ঢুকতে। ইফিগেনেইয়াকেও ব্যবহার করা হয় যুদ্ধের উদ্দেশ্যে। বিবাহের সংবাদ দিয়ে তাঁকে ডাকেন পিতা। সুদূর আর্গোস থেকে ট্রয়ে এসে ইফিগেনেইয়া জানতে পারে, এ আয়োজন বিবাহের নয় মৃত্যুর। আর্তেমিসের দেবতার তখন দরকার ছিল সবুজ তাজা প্রাণের রক্ত। তাই রণকৌশলে তাঁকে ব্যবহার করেন তাঁর পিতা স্বয়ং। ইফিগেনেইয়া ও অভিমন্যুর মধ্যে একটা মিল ছিল। তা মৃত্যু। আর যে পার্থক্যটা শিশিরকুমার দাশ চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন তা হলো লিঙ্গা-বৈষম্যের রাজনীতি। ইফিগেনেইয়া যখন অভিমন্যুকে বলে — 'তোমার মৃত্যু তো পতঙ্গের মৃত্যু নয়। মৃত্যু তোমাকে দিয়েছে মহিমা। তুমি পুরুষ, আমি নারী। আমি চিরকুমারী, দেবতার পূজায় উৎসর্গিতা। তুমি সৈনিক, যুদ্ধের ইতিহাসে তুমি চিরস্মরণীয়। যারা তোমায় অন্যায়ভাবে মেরেছে, তারা ইতিহাসে চিরঘৃণিত। আমি সৈনিক নই, যুদ্ধ আমাকে কোনও গৌরব দেয়নি। আমি শুধু একটা বলি।'[২৮] তখন আমাদের সামনে উঠে আসে একটি ক্ষমতার ভাষ্য, যা নারীবিরোধী পিতৃতন্ত্রের কণ্ঠস্বর।

 © Santiniketan Sahityapath

'উর্বশী ও আর্তেমিস' এ উর্বশী ও আফ্রোদিতের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে এই নাটকে দাঁড়িয়ে পড়ে আরেক চরিত্র — আর্তেমিস। আফ্রোদিতে কামের দেবী, আর উর্বশী কামসঞ্চারকারী নর্তকী। উর্বশী ও আর্তেমিসের চরিত্রগত পার্থক্য উঠে আসে উর্বশীর বয়ানে- "তুমি মানুষের মনে, শরীরে কামনা জাগাও। মানুষ উন্মত্ত হয়ে ছোটে। আমিও তাই। কত ঋষি মুনি তাদের তপস্যার সব ফল আমারই পায়ে সমর্পণ করেছে। কিন্তু তুমি আগুন জ্বালাও দূর থেকে, অদৃশ্য থেকে, অমূর্ত থেকে। আর আমি? আমাকে উপস্থিত হতে হয় মানুষের সামনে। আমি একটা বস্তু। আমি একটা শরীর। আমাকে ভোলাতে হয় মানুষকে। সে আকৃষ্ট হয় আমার প্রতি। শুধু আমার প্রতি। শুধু আমিই তার লক্ষ্য — এই চোখ, এই ঠোঁট, এই বুক, আমার শরীর, শরীর।"[২৯] এই উর্বশীর মনে কামনার আগুন জ্বলেছিল অর্জুনকে দেখে। আফ্রোদিতে মেতেছিল হিপ্পোলুতুসের নেশায়। কিন্তু হিপ্পোলুতুস ও অর্জুন কেউই ইতিবাচক সাড়া দেয়নি। ফলত অভিশাপদগ্ধ হয়ে পড়েন তাঁরা। উর্বশী ও আফ্রোদিতের কামার্ত মনের বিরুদ্ধে ঘেন্না ছুঁড়ে দেয় আর্তেমিস।

তিন বন্দিনী নাটকে উঠে আসে দুটি ভিন্ন দেশের, ভিন্ন সময়ের তিনজন নারী চরিত্র — সীতা, পেনেলোপি ও হেলেন। পেনোলোপি স্বর্গের দেবী। ওদুসসেউস তাঁর স্বামী। তাঁর সঙ্গে রামচন্দ্রের কিছু মিল ছিল। রামচন্দ্রের জীবনের অনেকটা কেটেছিল অরণ্যে। ওদুসসেউসের সমুদ্রে। তবে, রাম ছিলেন সত্যবাদী আর সে মিথ্যানিপুণ। তবে, পেনোলোপি তাঁকে ভালোবেসেছিলেন তাঁর উত্তাপের জন্য, দুঃসাহসিকতার জন্য। নাটকের শুরুতেই পেনোলোপি রামের সঙ্গে পরিচয় করাতে চেয়েছিলেন সীতার মতোই আরেক মহাকাব্যের নায়িকা, তাঁর বোন হেলেনের সঙ্গে। সীতার জন্য যেমন লঙ্কাকাণ্ড, হেলেনের জন্য তেমন ট্রয়ের যুদ্ধ। সীতা ও পেনালোপি যখন পারস্পরের স্তুতি গাইতে ব্যস্ত, তখন নাটকের মোড় ঘোরাতে উপস্থিত হয় হেলেন। হেলেন রামচন্দ্রের সামনে স্পষ্ট করতে থাকে তিন নারীর জীবনের মিল — "কোনওদিন ভেবে দেখেছেন সীতার, পেনেলোপির আর আমার জীবনের মধ্যে একটা গভীর মিল আছে, গভীর মিল? সে মিল এই নয় যে আমাদের কেউ অপহরণ করেছিল। পেনেলোপি স্বদেশেই ছিল, কেউ তাঁকে অপহরণ করে কোথাও নিয়ে যায়নি। আমি স্বেচ্ছায় গিয়েছিলাম ট্রয়ে, কেউ অপহরণ করেনি। শুধু সীতাকেই রাবণ অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল বিদেশে। তিনজনের তিন রকম জীবন, ভিন্ন ভিন্ন।... মিল অন্য জায়গায়। জীবনে একটা সময়ে আমরা তিনজনেই ছিলাম অবরুদ্ধ।"[৩০] ওদুসসেউসের মৃত্যুর মিথ্যে সংবাদ সাজিয়ে ইথাকায় যখন নানা দ্বীপের রাজারা এসে আস্তানা গেড়ে বসেছিল, তখন স্বদেশে পরবাসী হয়ে ভৃত্যের মতন বন্দিনী হয়ে জীবন কাটিয়েছেন পেনেলোপি। সে বলতে পারেনি — তোমরা চলে যাও। বলতে পারেনি — ওদুসসেউস বাঁচুক আর মরুক সে সমস্যা আমার, তোমাদের নয়। তিন নারী চরিত্র পিতৃতান্ত্রিক সমাজে হয়ে উঠেছিল যুদ্ধের পুরস্কার মাত্র। হেলেনের বয়ানে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে — 'আমি তখন যুদ্ধের পুরস্কার। যে জিতবে আমি তার। যদি ট্রয় জিতত আমি থাকতাম ট্রয়ে। গ্রিস জিতেছিল তাই আমি হলাম গ্রিসের।... সীতার ভাগ্য স্থির হয়ে গিয়েছিল যেদিন রাবণ তাকে বন্দিনী করল। যে জিতবে, সীতা তার।... তোমার ক্ষেত্রেও তাই পেনেলোপি। ওদুসসেউস ফিরে এলেন, যুদ্ধ করলেন রাজপুরুষদের সঙ্গে। যুদ্ধে না জিতলে তোমার ভাগ্য হত অন্য।... আমরা তিনজনেই তাই বন্দিনী। তিনজনই যুদ্ধের।"[৩১] শিশিরকুমার দাশের এই নাটক পুরাণ, মিথ-এসবের ঊর্ধে উঠে যুদ্ধের পিতৃতান্ত্রিক চরিত্রকে সজোরে ঘোষণা করে যান। হেলেন যখন বলে ওঠে — "দুই পুরুষের লড়াই। কিন্তু সে প্রতিশোধের উপকরণ, সে প্রতিহিংসার অস্ত্র। আর তুমি অরক্ষিত নারী, অরক্ষিত মাটি।'[৩২] তখন নারীবিদ্বেষী সমাজের চারিত্রিক মানচিত্র ফুটে ওঠে সমকালের আয়নায়।

'দুই বালক' নাটকের চরিত্র দুই হতভাগ্য বালক চরিত্র — ট্রয়ের সেনাপতি হেকতোরের পুত্র আস্তুয়ানাক্স ও 'ডাকঘর' নাটকের অমল। দুই বালকই সম্মুখীন হয় এক ভয়ংকরণ মারণব্যাধিতে। ফলে, অল্পবয়সেই ঘটে মৃত্যু। তবে, আস্তুয়ানাক্স আর অমলের পৃথিবী আলাদা। আস্তুয়ানাক্সের ট্রয়, সংঘর্ষ, সংগ্রাম। অমলের পাঁচমুড়া পাহাড় আর শ্যামলী নদী। আস্তুয়ানাক্সের সমস্ত স্মৃতি যুদ্ধআর হত্যা আর মৃত্যু দিয়ে ঘেরা। আর অমলের সব স্মৃতি মৃদু, স্নিগ্ধ, শ্যামলী নদীর তীরের গাই, দইওয়ালার সুর, প্রহরীর ঘন্টা দিয়ে মোড়া। দুজনেই ফিরতে চায় আবার মর্ত্যলোকে, নিজের দেশে, প্রিয় নদীর ধারে। আস্তুয়ানাক্স জানায় — 'আমার জন্মভূমি ডাকছে। আমার প্রিয় নদী, প্রিয় সমুদ্র ডাকছে। রক্ত ডাকছে, প্রতিশোধ ডাকছে। আমার স্মৃতি, আমার অতীত আমাকে ডাকছে।' সে প্রশ্ন করে অমলকে — 'কিন্তু অমল, তুমি কেন ওই পৃথিবীতে যেতে চাও, যেখানে এত রক্ত?'[৩৩] অমল জানায়, 'না, না, পৃথিবীতে রক্ত নেই, হত্যা নেই। আসলে মানুষের অসুখ করেছে। তাই সে হত্যা করে, তাই সে হিংসে করে। কিন্তু অসুখ নিশ্চয়ই সেরে যাবে।'[৩৪] শিশিরকুমার দাশ এই নাটকে উন্মোচন করেন সময়ের গভীর 'অসুখ'কে। সেই অসুখ সেরে যাওয়ারও স্বপ্ন বুনে যায় এই নাটক।

© Santiniketan Sahityapath

শিশিরকুমার দাশের 'অলৌকিক সংলাপ' বহু ক্রোশ পথ হেঁটে পৌঁছে যায় স্বপ্নের জাদুবাস্তবে। তার সঙ্গে সঙ্গে পথ হেঁটে চলে পাঠকও। নাট্যকে সঙ্গে আমরাও পৌঁছে যাই সাহিত্যের এক স্নিগ্ধ পৃথিবীতে যেখানে হত্যা নেই, মৃত্যু নেই, রক্ত নেই, নেই পিতৃতন্ত্রের আনুগত্য। সাহিত্যতাত্ত্বিক, পণ্ডিত শিশিরকুমার দাশের ক্ষেত্রে নাটক তাঁর প্রতিষ্ঠার ভূমি নয়, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক দাবি দাওয়া মেটাবার দায় নেই তাঁর সেখানে। গ্রিকচর্চাও তাঁর নিতান্ত ভালোবাসার কারণেই। তাহলে শিশিরকুমার দাশ বারবার কেন ফিরে আসেন নাটকে? কেন চলে যান গ্রিসে? কেন ফিরে চান 'ক্লাসিকে'? কেন পুরাণকে নবনির্মাণ করেন? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে দেয় অলৌকিক সংলাপ। আধুনিক বাংলা নাটকের বাঁকবদলকারী এই প্রচেষ্টার মধ্যে কেবল নাট্যগুণই নিমজ্জিত হয়ে থাকে না, নিমজ্জিত হয়ে থাকে সাহিত্য-তত্ত্ব, 'cultural studies' ও 'gender studies' এরও এক বিরাট ক্ষেত্র। যে শিশিরকুমার বিদ্বান, যে শিশিরকুমার একাগ্রতায় চর্চা করেন গ্রিক ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও সময়, যে শিশিরকুমার একাগ্রতায় চর্চা করেন গ্রিক ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও সময়, যে শিশিরকুমার সক্রেটিস-এর সখ্যে নামেন অবলীলায় সেই শিশিরকুমারই তো লেখেন,

"হেমলকের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে আমার শরীরে
আমি রোজ দেখছি, তুমি মুখ ঢেকে দিয়েছ
চোখ বন্ধ করেছ
তোমার শেষ কথা কি আর বলা হবে না?
কুকুরের নামে শপথ করে
তোমাকে ডাকছি সক্রেটিস!"[৩৫]

কুকুরের নামে শপথ করে, সমসময়কে ধিক্কার জানিয়ে, প্রতিক্রিয়ার প্রতিশোধ নিতে তিনি সক্রেটিসকে ডাকেন। বারবার ডাকেন। ডাকেন তেইরেসিয়াস, ইফগেনেইয়া, পরশুরাম থেকে শুরু করে অলৌকিক সংলাপের সব চরিত্রদের। অলৌকিক সংলাপ পায়ের তলায় পায় বাস্তবের মাটি, সমকাল।

তথ্যসূত্র:

১. 'শিশিরকুমার দাশ বাংলা উপন্যাস বিশেষ যুগ্ম সংখ্যা', 'সাক্ষাৎকার'এর অন্তর্গত, চিন্ময় গুহ, এবং মুশায়েরা, সুবল সামন্ত সম্পাদিত, শারদীয় ১৪১০, ৩৮/এ/১ নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা ৭০০০৯০, পৃ. ১২৯

২. ওই, পৃ. ১৩৫

৩. 'অলৌকিক সংলাপ', শিশিরকুমার দাশ, কারিগর, ৩৫বি ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা ৭০০০০৪, চতুর্থ মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৭, পৃ. ৫

৪. তদেব, পৃ. ১১

৫. 'শিশিরকুমার দাশ বাংলা উপন্যাস বিশেষ যুগ্ম সংখ্যা', 'সাক্ষাৎকার'এর অন্তর্গত, চিন্ময় গুহ, এবং মুশায়েরা, সুবল সামন্ত (সম্পাদিত), শারদীয় ১৪১০, ৩৮/এ/১ নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা ৭০০০৯০, পৃ. ১৩৫

৬. 'শিশিরকুমার দাশ বাংলা উপন্যাস বিশেষ যুগ্ম সংখ্যা', 'অবলুপ্ত মননের মধু?'র অন্তর্গত, সৌরীন ভট্টাচার্য, এবং মুশায়েরা, সুবল সামন্ত (সম্পাদিত), শারদীয় ১৪১০, ৩৮/এ/১ নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা ৭০০০৯০, পৃ. ৭৫

৭. 'শিশিরকুমার দাশ বাংলা উপন্যাস বিশেষ যুগ্ম সংখ্যা', 'সাক্ষাৎকার'এর অন্তর্গত, চিন্ময় গুহ, এবং মুশায়েরা, সুবল সামন্ত সম্পাদিত, শারদীয় ১৪১০, ৩৮/এ/১ নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা ৭০০০৯০, পৃ. ১৩৪-১৩৫

৮. ওই, পৃ. ১৩৩

৯. 'শিশিরকুমার দাশ বাংলা উপন্যাস বিশেষ যুগ্ম সংখ্যা', 'তিনি, শিশিরকুমার দাশ, এক অসামান্য ব্যক্তি'র অন্তর্গত, তপোধীর ভট্টাচার্য, এবং মুশায়েরা, সুবল সামন্ত সম্পাদিত, শারদীয় ১৪১০, ৩৮/এ/১ নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা ৭০০০৯০, পৃ. ৯৬

১০. 'শিশিরকুমার দাশ বাংলা উপন্যাস বিশেষ যুগ্ম সংখ্যা', 'অবলুপ্ত মননের মধু?'র অন্তর্গত, সৌরীন ভট্টাচার্য, এবং মুশায়েরা, সুবল সামন্ত সম্পাদিত, শারদীয় ১৪১০, ৩৮/এ/১ নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা ৭০০০৯০, পৃ. ৭৮

© Santiniketan Sahityapath

১১. ‘শিশিরকুমার দাশ বাংলা উপন্যাস বিশেষ যুগ্ম সংখ্যা’, ‘সাক্ষাৎকার’এর অন্তর্গত, চিন্ময় গুহ, এবং মুশায়েরা, সুবল সামন্ত সম্পাদিত, শারদীয় ১৪১০, ৩৮/এ/১ নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা ৭০০০৯০, পৃ. ১৪০

১২. ওই, পৃ. ১৩৮

১৩. ওই, পৃ. ১৩৮

১৪. অলৌকিক সংলাপ, চতুর্থ মুদ্রণ, শিশিরকুমার দাশ, কারিগর, ৩৫বি ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা ৭০০০০৪, অক্টোবর ২০১৭, পৃ. ১৮

১৫. ওই, পৃ. ৮১

১৬. ওই, পৃ. ১৫

১৭. ওই, পৃ. ১৫

১৮. ওই, পৃ. ১৬

১৯. ওই, পৃ. ২১

২০. ওই, পৃ. ২৩

২১. ওই, পৃ. ৩২

২২. ওই, পৃ. ৩৪

২৩. ওই, পৃ. ৪০

২৪. ওই, পৃ. ৩২

২৫. ওই, পৃ. ৭৭

২৬. ওই, পৃ. ৭৭

২৭. ওই, পৃ. ১০১

২৮. ওই, পৃ. ১১৭

২৯. ওই, পৃ. ১২৯

৩০. ওই, পৃ. ১৫১-১৫২

৩১. ওই, পৃ. ১৫৩

৩২. ওই, পৃ. ১৫৪

৩৩. ওই, পৃ. ১৭০

৩৪. ওই, পৃ. ১৭০

৩৫. ‘শিশিরকুমার দাশ বাংলা উপন্যাস বিশেষ যুগ্ম সংখ্যা’, ‘অবলুপ্ত মননের মধু?’র অন্তর্গত, এবং মুশায়েরা, সুবল সামন্ত সম্পাদিত, সৌরীন ভট্টাচার্য, শারদীয় ১৪১০, ৩৮/এ/১ নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা ৭০০০৯০, পৃ. ৭৫

সহায়ক গ্রন্থ:

১. শিশিরকুমার দাশ, ‘অলৌকিক সংলাপ’, কারিগর, ৩৫বি ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা ৭০০০০৪, চতুর্থ মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৭

২. সুবল সামন্ত সম্পাদিত, এবং মুশায়েরা, ‘শিশিরকুমার দাশ বাংলা উপন্যাস বিশেষ যুগ্ম সংখ্যা’, ৩৮/এ/১ নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা ৭০০০৯০, শারদীয় ১৪১০

—